অঘোর মন্ডল

আমাদের ক্রীড়া সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া বুদ্ধিজীবী

খেলা নিয়ে উন্মাদনা-উত্তেজনা, মারামারি-কাটাকাটি সবই ছিল এই দেশে! এবং এখনও আছে। প্রথম বাক্যটা পড়ে ভ্রু কুচকে যেতে পারে অনেকের! ছিল মানে? তাহলে কী এখন নেই! এই যে ক্রিকেট নিয়ে এতো উত্তেজনা, আলোচনা-সমালোচনা, বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা হওয়ার পর দিয়ে গণমাধ্যম থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সব জায়গায় আবেগের যে জলোচ্ছ্বাস দেখা দিলে সেটা কী? তাসকিনের চোখের জল দেখলো গোটা বিশ্ব। বিসিবি কর্মকর্তাদের হৃদয়ও খানিকটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো সেই চোখের জল। এক ব্রিটিশ ভদ্রলোক, স্টিভ রোডস, যিনি বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে পথ দেখানোর দায়িত্ব নিয়ে আছেন। তিনিও পথ খুঁজতে গিয়ে, কোন এক ট্রাফিক সিগনালে তানকিনকে দাঁড়ানো দেখে, মনে করছেন, এই ভদ্রলোক হতে পারে, ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে তার দলের সেমি ফাইনালের পথ খুঁজে নেয়া একজন গাইড! তিনিও সাফ জানালেন; বিশ্বকাপ স্কোয়াডে তিনি তাসকিনকে চান। তাহলে তো একজনকে বিশ্বকাপ স্কোয়াড থেকে ছাঁটাই করতে হবে। সেটাও মোটামুটি বলে দিলেন বিসিবি সভাপতি। তরুণ পেসার রাহিকে বাদ দিলে তাসকিনকে স্কোয়াডে নেয়া যায়।

ক্রীড়া

অতএব খেলা নিয়ে বাংলাদেশে উত্তেজনা-উন্মাদনা নেই। আলোচনা-সমালোচনার ঘাটতি সেটা বলবেন কীভাবে? সুতরাং শেষ কথাটাই ঠিক। এখনো উত্তেজনা-উন্মাদনা আছে। যেমনটা ছিল আগে বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে। অবশ্য এটা ছিল একেবারেই ক্লাব ফুটবল নিয়ে। আরো স্পষ্ট করে বললে বলতে হবে; সেই মারামারি-কাটাকাটি সবই ছিল আবাহনী-মোহামেডনাকে ঘিরে। যা এখন ধুসর গোধুলি বেলার স্মৃতি। নস্টালজিয়ায় ভুগতে থাকা কেউ কেউ এখনও স্মৃতিকাতর হয়ে বলেন, সেটা ছিল আমাদের ফুটবলের 'সোনালি অতীত'! সোনালি, রুপালি বা ধুসর যে রঙ দিয়েই বর্ণনা করি সেই সময়টাকে, তার ওপর একটা কথা তুলির আঁচড়ের মতো পড়বে। আমাদের সব ছিল। শুধু ছিল না বলার মতো ফুটবলীয় সাফল্য। যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে আলাদাভাবে একটা ফুটবলীয় নেশন হিসেবে পরিচিতি এনে দিতে পেরেছে। ক্রিকেটে বিশ্বকাপ খেলার সুযোগটা বাংলাদেশ অর্জন করার পর কিছুটা হলেও সেই পরিচয়টা পাচ্ছে।

কিন্তু খেলাধুলা বাঙালির কাছে যতই জনপ্রিয় হোক, যতোই ক্রিকেট উন্মাদনায় ভুগতে থাকুক বাঙালি, এদেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতির অংশ খেলাধুলা

সেই স্বীকৃতি দিতে কেন যেন সমাজের বড় অংশের দিতে কাপর্ণ্য আছে। মুখে না বললেও, ভাবখানা এমন, খেলা! সেটা আবার সংস্কৃতির অংশ হয় কীভাবে! বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি। সেখানে খেলাধুলা জায়গা পায়নি। এটাই বাস্তবতা। অথচ বাঙালির অনেক নিজস্ব অনেক লোকজ খেলা আছে। আছে তার ঐতিহ্য। কৃষ্টি-সংস্কৃতির কথা উঠতেই সেটাকে জায়গা দেয়ার কথা ভাবা যায় না! আমরা ভাবতে পারি না। এর অবশ্য রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, করপোরেট বিজনেসসহ অনেক কারণ আছে। খেলা নিয়ে রাজনীতি হবে। খেলা নিয়ে করপোরেট বিজনেস হবে। কিন্তু খেলাকে বঙ্গীয় সংস্কৃতির অংশ ভাবা যাবে না। এই দেশের স্বাধীনতার বয়স প্রায় পঞ্চাশ হতে যাচ্ছে। স্বাধীনকাযুদ্ধে ক্রীড়াঙ্গনের মানুষের বড় একটা অংশগ্রহণ ছিল। তারাও স্বাধীনতা যুদ্ধেও অংশ ছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি বা স্বাধীনতা পদক, একুশে পদক দেয়ার সময় মনে করা হয়, এরা তো মাঠে-ঘাটের মানুষ এদের কেন আবার উঁচু জাতে তোলা হবে! নাচ-গান-সাহিত্য-বিজ্ঞান, কৃষি সবকিছুর জন্য পদক-টদক বরাদ্দ থাকে। কিন্তু খেলা থেকে যায় ব্রাত্য। ব্যতিক্রম হয়তো এখন কিছুটা ক্রিকেটের সৌজন্যে। কিন্তু ব্যতিক্রম তো ব্যতিক্রম। ক্রিকেটারদের তারকা খ্যাতি আছে। ক্রিকেটে করপোরেট পুঁজি আছে তাই ক্রিকেটটাকে একটু পাত্তা দেয়া হয়। কিন্তু সার্বিকভাবে খেলা বাঙালির সংস্কৃতি দূরবীন দিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না!

যায় না; তার বড় একটা কারণ হচ্ছে বাঙালি খানিকটা আত্মবিস্মৃত জাতি। তার খেলাধুলোর লিখিত ইতিহাসের পাশাপাশি কোন প্রামাণ্য ইতিহাসও নেই। খেলা নিয়ে এখানে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চারও আকাল। যারা করতে পারতেন, তাদের সেই সুযোগটা দেয়া হয়নি। অথবা অন্যভাবে বলতে হবে; তারা সেই সুযোগটা আদায় করে নিতে পারেনি। এই দেশে আদায় করে নেয়া ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের জন্মই হয়েছে; অধিকার আদায় করে নেয়ার পথ ধরে। সেই জায়গাটায় ব্যর্থ ক্রীড়াঙ্গনের মুক্তচিন্তার মানুষগুলো। সেটা তাদের অভিমানজাত ব্যর্থতা।

টেলিভিশনের টকশোগুলোতে চোখ রাখলে দেখা যায়, সবাই এখন সব কিছু বুঝছেন। বলছেন। রীতিমতো বিশিষ্টজনের মতো বলছেন। ক্রিকেটের মতো একটা শুদ্ধ, জীবনদর্শনভিত্তিক খেলা নিয়েও কত মানুষে কত কথা বলছেন। শুনে মনে হয়; এটা কোন ব্যাপার! সাকিব আল হাসান বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার আগে শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ফটো সেশনে অংশ নিলেন না কেন? তা নিয়ে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া সমালোচনার ফণি ফনা তুললো! আবার জার্সির রঙ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঝড় উঠলো। প্রধানমন্ত্রী সংসদে বক্তৃতা দিলেন! এটা যদি হয় আমাদের ক্রীড়া সংস্কৃতির অংশ তা হলে বলার কিছু থাকে না। আবার সত্যিকার অর্থে যারা ক্রিকেট নামক খেলাটার চেতনা অন্তরে ধারণ করেন, ক্রিকেট চর্চার ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠে ক্রিকেটে সমর্পিত প্রাণ হিসেবে ক্রিকেটাঙ্গনে পরিচিত, তারা থাকলেন নীরব! অথবা অভিমান করেই নিশ্চুপ থাকাকেই শ্রেয় মনে করলেন! অথবা আমাদের মিডিয়া যারা নিজেরাও করপোরেট পুঁজির কাছে দায়বদ্ধ তারা সেই লোকগুলোকে আলোচনা থেকে দূরে রাখার পথে হাঁটলেন!

বাংলাদেশ কেন, বিশ্বে যখনই কোন বড় ঘটনা ঘটছে তখন পত্রিকার পাতাগুলোয় কত বিশ্লেষণ, কত আলোচনা, মুক্তবুদ্ধিও চর্চা হিসেবে কত খোলা কলাম লেখা হয়। কিন্তু বৎসরে তিনশ পয়ষট্টি দিনে সব মিলিয়ে কি খেলা নিয়ে পনেরটা বিষয় সম্পাদকীয় বা উপ-সম্পাদকীয়তে জায়গা পাচ্ছে? কোন রকম দ্বিধা-সংশয়, তর্ক-বিতর্ক ছাড়াই বলা যায়; এদেশে ক্রিকেট সাংবাদিকতায় নতুনমাত্রা যোগ করার অগ্রপথিক উৎপল শুভ্র। যার নামটাই একটা ব্র্যান্ড। প্রথম আলোর মত পত্রিকার বড় একটা পাঠক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে তাঁর নামের কারণে। লেখার কারণে। তাঁর লেখার অনুসারী সাংবাদিকদের ভেতরেও অনেকে। কিন্তু সেই ভদ্রলোক বই লিখছেন। দেশ-বিদেশ থেকে খেলার খবর পাঠাচ্ছেন। লিখছেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের কাগজেও মনে হয় একটা জায়গায় ব্রাত্য। সেটা হচ্ছে, সম্পাদকীয় বা উপ-সম্পাদকীয় লেখার জায়গাটায়! উনিশ পেরিয়ে বিশে পা রাখা প্রথম আলো-তে উৎপল শুভ্র গোটা বিশেষ উপ-সম্পাদকীয় লিখেছেন কী না পাঠক হিসেবে সন্দেহ আছে! কিন্তু সেই সংখ্যাটা যদি বিশ বছরে শ'পাঁচেক হলেও এদেশের ক্রীড়া নীতি, ক্রীড়া সংকৃতিতে বড় একটা প্রভাব ফেলতো। একই কথা প্রযোজ্য প্রথম আলো থেকে সম্প্রতিক সাবেক হয়ে যাওয়া পবিত্র কুদ্দুর বেলায়ও। এতো ক্ষুরধার লেখা

বাংলাদেশ কেন, বিশ্বে যখনই কোন বড় ঘটনা ঘটছে তখন পত্রিকার পাতাগুলোয় কত বিশ্লেষণ, কত আলোচনা, মুক্তবুদ্ধিও চর্চা হিসেবে কত খোলা কলাম লেখা হয়। কিন্তু বৎসরে তিনশ পয়ষট্টি দিনে সব মিলিয়ে কি খেলা নিয়ে পনেরটা বিষয় সম্পাদকীয় বা উপ-সম্পাদকীয়তে জায়গা পাচ্ছে? কোন রকম দ্বিধা-সংশয়, তর্ক-বিতর্ক ছাড়াই বলা যায়; এদেশে ক্রিকেট সাংবাদিকতায় নতুনমাত্রা যোগ করার অগ্রপথিক উৎপল শুভ্র। যার নামটাই একটা ব্র্যান্ড। প্রথম আলোর মত পত্রিকার বড় একটা পাঠক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে তাঁর নামের কারণে। লেখার কারণে। তাঁর লেখার অনুসারী সাংবাদিকদের ভেতরেও অনেকে। কিন্তু সেই ভদ্রলোক বই লিখছেন। দেশ-বিদেশ থেকে খেলার খবর পাঠাচ্ছেন। লিখছেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের কাগজেও মনে হয় একটা জায়গায় ব্রাত্য

বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিকতার ইতিহাসে ক'জন লিখতে পেরেছেন তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। কিন্তু তিনিও কোন এক অজানা কারণে নিজে কম লিখে অন্যের লেখা ঘষামাঝা করে অন্যদের লেখক বানানোর কারিগরের ভূমিকা বেছে নিলেন! চাইলে স্বাধীন বাংলাদেশের ক্রীড়া ইতিহাস নিয়ে তিনিও প্রামাণ্য কিছু লেখা-লেখা করলে তাতে সমৃদ্ধ হতো বাঙালির ক্রীড়া ইতিহাস। তবে সবচেয়ে বেশি দুঃখ আর হতাশা নিয়ে লিখতে হচ্ছে একটা নাম। জালাল আহমেদ চৌধুরী। ক্রীড়া সাংবাদিকদের সাংবাদিক মনে করা হয় যাকে। তাঁকে নিয়ে হতাশাটা অন্য কারণে। তিনি কী না? ক্রিকেটে সমর্পিত এক প্রাণ। ক্রিকেটার ছিলেন। খেলাটার প্রচণ্ড দুর্বলতা তাঁর। খেলাটাকে ভালোবেসে খেলেছেন। খেলা ছেড়েছেন। কিন্তু মাঠ ছাড়েননি। কোচ হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়ে আবার দায়িত্ব নিয়েছেন জাতীয় দলে। বিভিন্ন ক্লাব দলের। জীবনের লম্বা একটা সময়কে পেছনে ফেলে এসেও ক্রিকেটপ্রেমে তাঁর সামান্য কমতি আছে বলে মনে হয় না। চিকিৎসকের নিষেধাজ্ঞাকে দূরে সরিয়ে রেখে, সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ান। রাত জেগে খেলা দেখেন। খেলার আড্ডায় অনেক সময় ভুলে যান রাত ক'টা বাজে! খুব সংবেদনশীল একমন নিয়ে এখনও তিনি খেলার মাঠের মানুষ, খেলার আড্ডার মানুষ। তবে তিনি অনেকগুলো প্রজন্মকে বঞ্চিত করেছেন নিজের ক্রীড়া সাহিত্য থেকে। সাংবাদিকতার লম্বা ক্যারিয়ারের দাঁড়ি টানতে বাদ্য হয়েছিলেন সরকারি সিদ্ধান্তে যখন টাইম পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপরও কিছু কিছু পত্রিকায় তিনি খেলা নিয়ে কলাম লিখেছেন। ধীরে ধীরে সেই লেখার স্রোত কমে গেলো! পত্রিকাগুলোও তাদের সাপ্তাহিক খেলার পাতাটা বন্ধ করতে শুরু করলেন। হয়তো খরচ কমানোর দিকেই ঝুঁকলেন সবাই। কিন্তু কেউ বুঝতে চাইলেন না, তাতে

মানও কমতে শুরু করলো। পাঠক, হারাতে শুরু করলো জালাল আহমেদ চৌধুরীর মতো লেখকদের। জালাল আহমেদ চৌধুরী শুধু সাবেক ক্রিকেটার, ক্রিকেট কোচ, লেখক, সাংবাদিক এই কথাগুলো লিখে নিজে যে উদ্যত্ত দেখালাম সেটা তাঁর কাছ থেকে কিছুটা স্নেহ পেয়েই। তবে জালাল আহমেদ চৌধুরী শুধু ক্রীড়াঙ্গনের নিবেদিত এক প্রাণ নন। তিনি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সব শাখায় মৃদু পায়ে হেঁটে চলা লোক। নিঃশব্দ বিচরণ তার সংস্কৃতির অন্য অঙ্গনেও। ক্রিকেট তাঁর প্রেম-ভালোবাসা।

ক্রীড়া সাহিত্য নিয়ে কাজ করেছেন আরো অনেকেই। কবি সানাউল হক খান। একুশে পদক পেয়েছেন সাহিত্যে। কিন্তু তিনি যতো নিউজপ্রিন্ট খরচ করছেন খেলার কবিতা, ছড়া আর লেখায় তার মূল্যায়ন কী পেলেন! বাংলা ক্রীড়া সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃত কামরুজ্জামান, চাইলে অন্য অনেক পেশায় যিনি চলে যেতে পারতেন, কিন্তু খেলাকে ভালোবেসে আইনজীবী বাবার ইচ্ছেকে পাত্তা না দিয়ে খেলা আর খেলার সাংবাদিকতাকেই ঘর-সংসার বানিয়ে ফেললেন! এরকম আরো অনেক নাম আছে। কিন্তু তাঁদের ক'জনকে স্বীকৃতি দেয় এই সমাজ। কিংবা আমাদের ক্রীড়া সমাজ! এই দীনতা নিয়ে ক্রীড়া সংস্কৃতির উন্নতি হবে কীভাবে?

বাঙালির ক্রীড়া ইতিহাস খেলার কথা যাদের, তাদের ইতিহাসটাই আমরা জানি না। সেটা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর থেকে গেলো অকথিত। তাহলে বাংলার ক্রীড়া সংস্কৃতি দৈন্য চেহারা ফুটে ওঠা খুব অস্বাভাবিক কিছু কী! মোটেও অস্বাভাবিক নয় ক্রীড়া বুদ্ধিজীবীর আকাল তৈরি হওয়া। এক স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের গৌরব গাথাকে সঠিক এবং নির্মোহভাবে আমরা তুলে ধরতে পারিনি। পারিনি ইতিহাসটাকে সঠিকভাবে লিখতে। কিংবা তাঁদের সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটা অধ্যায় হিসেবে জায়গা দিতে। ইতিহাস বিকৃতি বাঙালির সংস্কৃতির বড় একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রীড়া ইতিহাস বিকৃতিও সেই অপসংস্কৃতির বাইরে থাকছে না বা আমরা রাখতে পারিনি। বলা হয়, এই দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে শুরু করে আমাদের অনেক কিছুই।

স্বাধীনতার পর ফুটবলে জোয়াল এসেছিল। যদিও সেই জোয়ারের শুরু পাকিস্তান আমল থেকে। ফুটবলের জোয়ারের সামনে বাঙালির ক্রিকেটপ্রেম বুদবুদের আকারেও দেখা যায়নি। পাকিস্তান তখনও টেস্ট প্লেয়িং কান্ট্রি। কিন্তু বাঙালির বিশ্বাস ছিল, কিছু হলে বাঙালির ফুটবলেই হবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ফুটবলাররা সবার আগে ফুটবল পায়ে যুদ্ধে নেমে পড়লেন। বিশ্ব ইতিহাসে এ এক নজিরবিহীন ঘটনা। তার রেশ ধরে সত্তর-আশি-নব্বই দশকে সেই ফুটবল উন্মাদনায় মেতে থাকলো বাঙালি। বাঁক পরিবর্তন ঘটলো নব্বই দশকের শেষ দিকে এসে। বাংলাদেশ যখন বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলার সুযোগ পেলো। এদেশের মানুষের চিন্তা-ভাবনায়ও একটা পরিবর্তন শুরু হলো। তারা ভাবতে শুরু করলো। ধুর, ফুটবলে কিছু হবে না! হলে ক্রিকেটে কিছু হতে পারে। হতেও শুরু করলো।

বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলে, টেস্ট খেলে। কিছু সাফল্য পাচ্ছে। ক্রিকেটের আগে ফুটবলের বাইরে আর একটা আশার বুদবুদ জেগেছিল বাঙালির মনে। সেটা আশির দশকের মাঝামাঝি। এশিয়া কাপ হকিতে যখন বাংলাদেশ ভালো করলো। এদেশের মানুষের স্বপ্নের পরিধি বাড়তে শুরু করলো। তারা ভাবতে শুরু করলো; বিশ্বকাপ খেললে হকিতেই খেলবে বাংলাদেশ। হকিতে একটা পুরোনো ঐতিহ্যও ছিল। আব্দুস সাদেক, ইব্রাহিম সাবেরের মতো তারকারা পাকিস্তান দলে খেলেছেন। বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু বাঙালির সেই স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়তে সময় লাগেনি। কারণ, হকির অধঃপতন শুরু হয় নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে।

জাগরণ এসেছিল আরো অনেক খেলায়। নিয়াজ মোর্শেদ গত শতাব্দির আশির দশকের মাঝামাঝি এই উপমহাদেশের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন দাবায়। দাবাড়ু হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন অনেকে। কিন্তু বুদ্ধিচর্চার এই খেলাটাকে আমাদের সমাজ এগিয়ে নেয়ার পৃষ্ঠপোষকার দিকে ঝুঁকলো না! তাই দাবায় খুচরা কিছু সাফল্য আসতে শুরু করলো। কিন্তু বিশ্ব পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে অন্যদের টেক্কা দিতে হবে, এই মানসিকতা আমাদের ক্রীড়া প্রশাসন থেকে শুরু করে বিভিন্ন করপোরেট হাউস কেউ যেন সেটা বুঝতে চাইলেন না! মেধার দিক থেকে অগ্রণ্য

বাঙালির ক্রীড়া ইতিহাস খেলার কথা যাদের, তাদের ইতিহাসটাই আমরা জানি না। সেটা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর থেকে গেলো অকথিত। তাহলে বাংলার ক্রীড়া সংস্কৃতি দৈন্য চেহারা ফুটে ওঠা খুব অস্বাভাবিক কিছু কী! মোটেও অস্বাভাবিক নয় ক্রীড়া বুদ্ধিজীবীর আকাল তৈরি হওয়া। এক স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের গৌরব গাথাকে সঠিক এবং নির্মোহভাবে আমরা তুলে ধরতে পারিনি। পারিনি ইতিহাসটাকে সঠিকভাবে লিখতে। কিংবা তাঁদের সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটা অধ্যায় হিসেবে জায়গা দিতে। ইতিহাস বিকৃতি বাঙালির সংস্কৃতির বড় একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রীড়া ইতিহাস বিকৃতিও সেই অপসংস্কৃতির বাইরে থাকছে না বা আমরা রাখতে পারিনি

কিছু মানুষকে এ খেলাটার দেখভালের দায়িত্বও দেয়া হলো না।

বাঙালির ক্রীড়া সংস্কৃতিতে নব্বই দশকের শেষ দিকে নতুন একটা মাত্রা যোগ হয়েছিল ক্রীড়া গণতন্ত্র। অনেক দাবি, অনেক স্লোগান, অনেক পোস্টার, অনেক লেখালেখির পর দেশজ ক্রীড়াঙ্গনে ক্রীড়া গণতন্ত্র এসেছিল। সেটা ওবায়দুল কাদের সাহেবের হাত ধরে। আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনৈতিক স্বদিচ্ছায়। কিন্তু এরপর সেই ক্রীড়া গণতন্ত্র বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে হয়ে দাঁড়ালো দলতন্ত্রের বড় হাতির। জাতীয় পুরস্কার পেতে হলে দলের মতাদর্শের লোক হতে হবে! আপনার ক্রীড়া দক্ষতা এখনো বিবেচ্য নয়।

বিভিন্ন ফেডারেশনের সদস্য হতে হলে আপনার দলদাস হতে হবে। আপনার ক্রীড়ামনস্ক চিন্তা-চেতনার কোন মূল্য নেই। খেলার অঙ্গনে স্পন্সর হিসেবে আসছেন, তিনি দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। সত্যি কথা কী বাঙালির ক্রীড়াঙ্গনের অনেক স্বপ্ন আতুড় ঘরে মারা গেছে। মারা যায়। কিন্তু এই টাকা নিয়ে ক্রীড়াঙ্গনে বিনিয়োগ করলে রাজনীতিবিদ হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা খুব কম।

আসলে সময়ের সাথে সাথে পাল্টে গেছে বাঙালির ক্রীড়া চর্চার ধরন। পাল্টে গেছে ক্রীড়া মনস্ক মানুষগুলোর চিন্তা-ভাবনা। সময়, পরিবেশ, পরিস্থিতি তাঁদের পাল্টাতে বাধ্য করেছে। খেলাধুলার প্রতি ভালোবাসা থেকে এখন আর আগ বাড়িয়ে কেউ ক্রীড়াঙ্গনে আসতে চান না। আসলেও টিকে থাকতে পারেন না।

কারণ, শুরু থেকেই বাঙালির ক্রীড়া সংস্কৃতি শক্ত ভিতের ওপর গড়ে ওঠেনি। আর যারা গড়ে দিতে পারতেন সেই মুক্তচিন্তার ক্রীড়ামনস্ক মানুষগুলো এখন ক্রীড়াঙ্গনে ব্রাত্য।